এশিয়ার অন্যতম সেরা সিনেমা
‘ধীরে বহে মেঘনা’

বাঙালি জাতির পরিচয়ের মূল শেকড় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে নয় মাস যুদ্ধ করে আমরা পেয়েছি স্বাধীন এই রাষ্ট্র। ইতিহাস যেন বোনা আছে অনেক চলচ্চিত্রের পরতে পরতে। তরুণ প্রজন্ম সেই ইতিহাস জানতে পারবে যেসব সিনেমা দেখে তেমন একটি সিনেমার নাম ‘ধীরে বহে মেঘনা’। মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নিয়ে **মৌ সন্ধ্যার** নিয়মিত আয়োজনে এ পর্বে আমরা জানবো **‘ধীরে বহে মেঘনা’** সম্পর্কে।

স্বপ্নমুখর দিনের সিনেমা

স্বাধীনতার পর যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ যখন নতুন করে সেজে উঠছে। কিভাবে এই দেশটাকে সাজানো হবে সেই স্বপ্নে যখন সবাই বিভোর হয়ে আছে। সেই সময় নির্মিত হয়েছে ‘ধীরে বহে মেঘনা’। চলচ্চিত্রটি মুক্তির আলোয় আসে ১৯৭৩ সালে। এখানে দেখা যায়, ভারতীয় মেয়ে অনিতার প্রেমিক মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়। সে ঢাকায় এসে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে আরো গভীরভাবে মর্মাহত হয়। মানবিকতাবোধে আচ্ছন্ন হয় তার হৃদয়। প্রাথমিকভাবে ‘ধীরে বহে মেঘনা’ চলচ্চিত্রের মূল পরিকল্পনা করেছিলেন জহির রায়হান। এই নির্মাতা নিখোঁজ হন। পরে ১০৯ মিনিটের এই সিনেমাটি রচনা এবং পরিচালনা করেছেন আলমগীর কবির। এটি আলমগীর কবির পরিচালিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

যাদের অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছে

‘ধীরে বহে মেঘনা’ চলচ্চিত্রে অভিনয়ে ছিলেন ববিতা, গোলাম মুস্তাফা, আনোয়ার হোসেন, খলিল উল্লাহ খান, হাসু ব্যনার্জী, আজমল হুদা প্রমুখ। অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেন সুচন্দা। চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেছে বাংলাদেশ ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনাল এবং পরিবেশনা করেছে স্টার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন। চিত্রগ্রহণ করেছেন অরুণ রায়, এম এ মোবিন এবং কমল নায়েক। সম্পাদক ছিলেন দেবব্রত সেনগুপ্ত।

চলচ্চিত্রের অর্জন

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ১০টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ধীরে বহে মেঘনা অন্তর্ভুক্ত করেছে। ২০০২ সালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের দক্ষিণ এশিয়ার চলচ্চিত্র তালিকায় সেরা ১০টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ৮ নম্বর অবস্থানে স্থান পেয়েছে ধীরে বহে মেঘনা।

চলচ্চিত্রের সংগীত

চলচ্চিত্রটির গান রচনা করেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং সুরারোপ করেছেন সমর দাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্য সাহা। এই চলচ্চিত্রে দুইটি গান সংযুক্ত হয়েছে এবং তাতে কণ্ঠ দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। এরমধ্যে একটি গানের শিরোনাম ‘কতো যে ধীরে বহে মেঘনা’।

সিনেমার পেছনের গল্প

নাবিল অনুসূর্য তার একটি লেখায় তুলে ধরেছিলেন ‘ধীরে বহে মেঘনা’ সিনেমার পেছনের গল্প। তারই চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো:

মুক্তিযুদ্ধের ওপর জহির রায়হান নির্মিত দুটো প্রামাণ্য চিত্র হলো ‘স্টপ জেনোসাইড’ (১৯৭১) ও ‘এ স্টেট ইজ বর্ন’ (১৯৭১)। তার তত্ত্বাবধানে আলমগীর কবির ও বাবুল চৌধুরী সেই সময় নির্মাণ করেছিলেন ‘লিবারেশন ফাইটার্স’ (১৯৭১) ও ‘ইনোসেন্ট মিলিয়নস’ (১৯৭১)। এসবের পরে ‘এবং ধীরে বহে মেঘনা’ নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন জহির রায়হান। চলচ্চিত্রটির কাহিনি একটি বাঙালি পরিবারকে নিয়ে। প্রেক্ষাপট মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তান সেনাবাহিনির গণহত্যার হাত থেকে বাঁচতে পালাচ্ছে পরিবারটি। নৌকাযোগে। সেই যাত্রার অনুষঙ্গ হিসেবে তুলে ধরা হবে যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রামাণ্যরূপ। পরিকল্পনায় সঙ্গে ছিলেন আলমগীর কবিরও। পাকিস্তানের পরাজয় তখন সময়ের ব্যাপার। সারা দেশ থেকে তাদের সেনাবাহিনি পিছু হটছে। পালাচ্ছে ঢাকার দিকে। জহির রায়হান পরিকল্পনা করেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিনগুলো সেলুলয়েডে ধরে রাখার। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের চালানো ধ্বংসযজ্ঞের প্রামাণ্য ফুটেজ নেওয়ার। সেগুলো ব্যবহার করা হবে ‘এবং ধীরে বহে মেঘনা’য়। সেজন্য ক্যামেরা জোগাড় করে দেন বিখ্যাত ভারতীয় চলচ্চিত্রকার হরিসাধন দাশগুপ্ত। কথা ছিল তিনজনে দৃশ্যধারণ করবেন। তাদের মধ্যে নারায়ণ ঘোষ মিতা শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি। ক্যামেরাম্যান কমল নায়েককে নিয়ে আলমগীর কবির মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ঢাকার পথে এগোন যশোর-খুলনা হয়ে। আর অরুণ রায়কে নিয়ে জহির রায়হান সরাসরি শত্রুমুক্ত ঢাকায় পৌঁছান বিশেষ বিমানে। ধারণ করেন বিজয়ের আনন্দে উত্তাল ঢাকার রাজপথের দৃশ্য। এরই মধ্যে শোনেন ভাইয়ের খবর। তার প্রিয় বড় ভাই নিখোঁজ। শহীদুল্লাহ কায়সার। ১৪ তারিখ থেকে। সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজে ফেরেন ভাইকে। গঠন করেন ‘বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটি’। দায়ী করেন মার্কিন ষড়যন্ত্রকে। পরের দিকে কেমন ক্ষেপে যান। দাড়ি রাখেন। ঘন ঘন যেতে থাকেন আজমীর শরীফে। সংবাদ সম্মেলন ডেকে ঘোষণা দেন শ্বেতপত্র প্রকাশের। ৩০ জানুয়ারি জোর করে অংশ নেন এক সামরিক রেইডে। মিরপুর তখনো সিভিল আর্মড ফোর্সেসের নিয়ন্ত্রণে। বিহারিদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনিকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনি। রেইডটি ছিল তাদেরই ধরতে। সেদিন সকালে কে একজন ফোন করে জহির রায়হানকে। সম্ভবত বিহারি নৃত্য পরিচালক মাস্তানা। জানায়, মিরপুর ১২ নম্বরে বন্দি আছেন শহীদুল্লাহ কায়সার। আরও কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে। তখনই বেরিয়ে পড়েন জহির রায়হান। সেদিন রেইডে অংশ নেয় সেনাবাহিনি ও পুলিশের মিলিত দল। তারা কোনোভাবেই বেসামরিক কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি ছিল না। কিন্তু জহির রায়হানের একগুঁয়েমির কাছে তাদের নতি স্বীকার করতে হয়। না করলেই বোধহয় ভালো হতো। কারণ সেদিন ঘাপটি মেরে থাকা বিহারিরা

কাপুরুষোচিত আক্রমণ করে মিলিত বাহিনির ওপর। শহীদ হন প্রায় পঞ্চাশ জন। তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব। জহির রায়হান।

এক নজরে আলমগীর কবির

রাঙামাটি থেকে লন্ডন

আলমগীর কবিরের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর রাঙামাটি শহরে। বাবা আবু সাইয়েদ আহমেদ ও মা আমিরুন্নেসা বেগম। তার আদি বাড়ি বরিশাল জেলার বানারীপাড়া। লেখাপড়া শুরু করেন হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৫২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পাস করেন। অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই ১৯৫৭ সালের শেষদিকে লন্ডন চলে যান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকসে বিএসসি ডিগ্রি নেন। ১৯৫৯ সালে লন্ডনে থাকাকালেই তিনি ডেইলি ওয়ার্কার নামের বামপন্থী দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৬২-৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্রের ইতিহাস, নন্দনকলা ও নির্মাণকৌশল বিষয়ে বেশ কয়েকটি কোর্স সম্পন্ন করেন।

আলমগীর কবিরের কর্মজীবন

১৯৬৬ সালে দেশে ফিরে ইংরেজি পত্রিকা দ্য অবজারভারে, পরে সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে হলিডে ছেড়ে এক্সপ্রেস নামে একটি ট্যাবলয়েড সাপ্তাহিকে জহির রায়হানের সঙ্গে সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ঝরঝরে ইংরেজি, দ্রুত এবং সাবলীল রিপোর্টিংয়ে সবার নজর কাড়েন। কঠোর ও বিশ্লেষণধর্মী চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে সুপরিচিত হন। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুনের ধারাবাহিক নাটক সিরাজ-উদ-দৌলাকে নিয়ে এক্সপ্রেস ট্যাবলয়েডের হেডলাইন ছিল 'দি লংগেস্ট বোরিং অন দ্য স্ক্রিন'। ষাটের দশকে চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি থেকে তিনি সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ পুরস্কার লাভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি বিভাগের প্রধান হয়ে কাজ করেন। আহমেদ চৌধুরী ছদ্মনামে তিনি ইংরেজি খবর ও কথিকা পাঠ করতেন। একই সময়ে প্রবাসী সরকারের প্রধান প্রতিবেদক হিসেবেও কাজ করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা হলেন যেভাবে

আলমগীর কবির একই সঙ্গে স্বল্পদৈর্ঘ্য, প্রামাণ্য ও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি শিল্প সমালোচনা ও চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শকও ছিলেন। সুইডিশ নির্মাতা ইঙ্গমার বার্গমানের দ্য সেভেনথ সিল (১৯৫৭) মুগ্ধ হয়ে বার কয়েক দেখেছিলেন। তখনই তার মধ্যে চলচ্চিত্র তৈরির বাসনা তৈরি হয়। পরে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে জহির

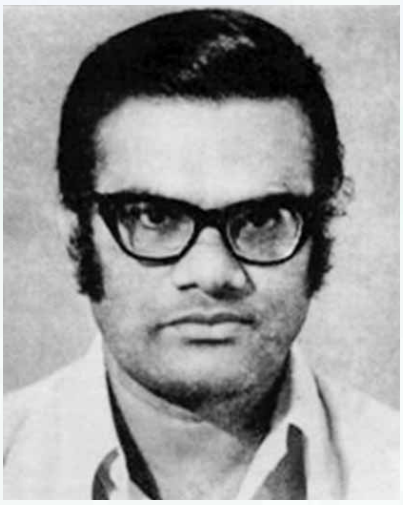

আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯)

রায়হানের স্টপ জেনোসাইড প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে কাজ করেন। পাশাপাশি নির্মাণ করেন লিবারেশন ফাইটার্স নামের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র। মুক্তিযোদ্ধা নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর সামনা-সামনি যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে এটি নির্মিত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের শপথ গ্রহণের দৃশ্য দেখানোর মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রটির সূচনা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সাউন্ড ট্র্যাকে ওভারল্যাপ করে এই ছবিতে প্রথম আসে। মুক্তিযোদ্ধাদের জয় বাংলা শপথ গ্রহণ আর সুর বাজছে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের। এভাবে নিজের আদর্শের পরিচয় তুলে ধরেন।

মুক্তিযুদ্ধের প্রবাসী সরকারের তথ্য বিভাগ থেকে তোলা নিউজ রিল ও ফুটেজ ব্যবহার করে তিনি নির্মাণ করেন প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ ডায়েরি নামে প্রামাণ্যচিত্র। অন্য কয়েকটি তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য, ধারাবর্ণনা রচনা করেন ও কণ্ঠ দেন। তার আরও কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হলো কালচার ইন বাংলাদেশ, সুফিয়ার অমূল্য ধন, ভোর হলো দোর খোল, আমরা দুজন, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, মণিকাঞ্চন ও চোরাস্রোত। তার নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হলো ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), সূর্যকন্যা (১৯৭৬), সীমানা পেরিয়ে (১৯৭৭), রূপালী সৈকতে (১৯৭৯), মোহনা (১৯৮২), মহানায়ক (১৯৮৪) ও পরিণীতা (১৯৮৫)।

রাজনীতিতে আলমগীর কবির

লন্ডন থাকাকালে তিনি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। লন্ডনে ইস্ট পকিস্তান হাউস, ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট প্রভৃতি সংগঠন গড়ে তোলেন এবং ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন আন্দোলনে সক্রিয় হন। ডেইলি ওয়ার্কারের জন্য কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রোর সাক্ষাৎকার নেন। তার কাছ থেকে গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা নেন। ব্রিটিশ পাসপোর্ট নিয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন। একই সময়ে তৎকালীন ফরাসি উপনিবেশ আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ফরাসি সরকারের হাতে ধরা পড়ে কয়েক মাস জেলে আটক ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি দেশে ফিরে বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এক পর্যায়ে আইয়ুব সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখে। জেল থেকে বেরিয়েও এক বছর তিনি নজরবন্দি থাকেন।

লেখক আলমগীর কবির

চলচ্চিত্র বিষয়ে আলমগীর কবির বেশ কয়েকটি বই রচনা করেন। এর মধ্যে ফিল্ম ইন ইস্ট পাকিস্তান, ফিল্ম ইন বাংলাদেশ, সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে ও মোহনা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ ১৯৭১' নামে স্বাধীন বাংলা বেতারে নিজের ভূমিকা নিয়ে লেখা একটি স্মৃতিচারণমূলক বই আছে।

পুরস্কার ও সম্মাননা

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ধীরে বহে মেঘনা' ১৯৭৩ সালে মুক্তি পায়। এই চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি এবং জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে 'সূর্যকন্যা' সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া এই চলচ্চিত্রের জন্য জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে 'সীমানা পেরিয়ে' চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে 'রুপালি সৈকতে' চলচ্চিত্রের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮২ সালে 'মোহনা' চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচয়িতার পুরস্কার পান। এটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়। সেই বছর মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মোহনা চলচ্চিত্রের জন্য ডিপ্লোমা অব মেরিট লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে 'পরিণীতা' জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৭৮ সালে। ২০১০ সালে তিনি সংস্কৃতি বিভাগে বাংলাদেশে স্বাধীনতা পুরস্কার পান করেন।

আলমগীর কবিরের পরিবার

১৯৬৮ সালে আলমগীর কবির বিয়ে করেন মনজুরা বেগমকে। বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাদের। এরপর অভিনেত্রী জয়শ্রীকে বিয়ে করেন। আলমগীর কবিরের তিন কন্যা সন্তান রয়েছে।

শেষ বিদায়

১৯৮৯ সালের ১৯ জানুয়ারি একটি চলচ্চিত্র সংসদের উদ্বোধন ও আবু সাইয়ীদ নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আবর্তন-এর প্রদর্শনীতে বগুড়ায় যান আলমগীর কবির। পরের দিন ২০ জানুয়ারি দুপুরের পর গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় রওনা হন। সন্ধ্যায় নগরবাড়ি ঘাটে ফেরিতে ওঠার জন্য পল্টুনের একপাশে অপেক্ষা করছিলেন। একটি ট্রাক ব্রেক ফেল করে তার গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেয়। সেই দুর্ঘটনায় একই গাড়িতে থাকা আরও কয়েকজনসহ মারা যান আলমগীর কবির।